নষ্টচাঁদ

অজিত দত্ত

বোধন

কালো এক বিহঙ্গ ডানায় বয়ে আনে অমঙ্গল,
শাদা আকাশের রৌদ্র মুহূর্তেকে হয় অন্ধকার।
নিঃশ্বাস নিরুদ্ধপ্রায়, পুষ্ট দেহ অসাড় অচল,
এখন প্রলয় যদি আসে পরিত্রাণ নাই আর।
আতঙ্কে সুরঙ্গ-পথে ভীত বীর খোঁজে রসাতল,
মহামান্য মহাজন প্রাণভয়ে করে হাহাকার,
পাপের নিয়তি আসে, অব্যর্থ সে গৃধিনী-কবল,
জীবন্তের শব-ভুক্, কৃষ্ণ অভিশাপ বিধাতার।

মাহেন্দ্র-মুহূর্ত এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর স্তুতির।
হে তান্ত্রিক, সুরু করো তোমার নিষ্ঠুর বামাচার
না হতে রক্তের স্রোতে খোঁজা শুরু স্বর্ণ শস্যকণা।
আবার সংগ্রাম হবে স্বর্ণ লঙ্কা আর জীর্ণ চীর,
পুনরায় আকাশেরে বিঁধে দেবে লক্ষ হাতিয়ার
ভীষ্মের মতন, যদি ব্যর্থ হয় তোমার সাধনা॥

১৯৩৯

ভঙ্গুর প্রবাল

দম্ভের গলিত ব্রণ যত পচা, স্ফীতকায় যত,
স্পর্শে তার তত বিষ, পূতিগন্ধে তত মহামারি,
অন্যায়ের বিস্ফোটক দেশে দেশে জাগে সারি সারি,
ভয়ঙ্কর বীভৎস সে, কিন্তু সুগভীর তার ক্ষত।
উন্মত্ত কুত্তার পিছে ধ্বংস আসে চাবুকের মতো,
সময়ের চোরাবালি তত টানে স্পর্দ্ধা যত ভারি,
সূর্যেরে যে ছুতে যায় পুড়ে মরা ভাগ্যলিপি তারি–
পাপ মহাপরাক্রম, কিন্তু তবু আয়ু তার কত?

হিংসার শোণিত সে কি মুছে নেবে সব শ্যামলতা?
মানুষের ধমনীতে কলঙ্ক কি রবে চিরকাল?
যদিও আজের মতো শুক্লা সন্ধ্যা নিষ্ফলা অযথা,
তবু জানি মৃত্যুহীন চাঁদের অতনু ইন্দ্রজাল।
স্পর্দ্ধারে অবজ্ঞা ক’রে কানে কানে হৃদয়ের কথা
উদ্যত অস্ত্রের নিচে জীবনের ভঙ্গুর প্রবাল॥

বৈশাখ ১৩৫০

পতঙ্গ

পতঙ্গের মরণের ডাক এলো
বৈশ্বানর, লেলিহান্‌ শিখা তোলো।

আকাশের জ্যোতির্লোকে ভ্রান্তি-বহ্নি–
যৌবনের ক্ষমাহীন মৃত্যুলোক,
ত্রিকালের পুঞ্জিভূত বিষবাষ্প
আমাদের আয়ু নিয়ে তৃপ্ত হোক।

হিংসাতপ্ত পৃথিবীতে মুহূর্তেক
তবু যদি পক্ষ মেলে পতঙ্গের,
পেয়ে থাকি দিগন্তের স্পর্শ-স্বাদ
জীবনের সে-সঞ্চয় অনন্তের।

যজ্ঞাগ্নিতে আহুতির লগ্ন এই,
চরিতার্থ এ-যৌবন বলি তার,
আকাঙ্ক্ষার প্রণয়ের মহত্ত্বের
তিলোত্তম, বলি আজ কবিতার।

তবু এই যজ্ঞফল সত্য হোক্‌
তৃপ্ত হোক রক্তলোভী স্বর্গলোক,
পতঙ্গের মরণের ডাক এলো,–
বৈশ্বানর মৃত্যু এই ধন্য হোক॥

১৯৪৪

বে-আব্রু

সেলাম করি সরকার!
মনের আব্রু ঘুচ্‌লো, এবার
চোখের আব্রু দরকার।

কতই কিছু স্বপ্ন ছিল
মনের মধ্যে বন্দী,
নতুন জীবন নতুন জগৎ
গড়ার অভিসন্ধি–
হুজুর, তুমি চোখ ফোটালে,
হাজার যুগের পুণ্য!
সকল জমা আজকে খারিজ
মনের খাতা শূন্য।

সেলাম করি সরকার!
মনের আব্রু ঘুচ্‌লো, এবার
দেহের আব্রু দরকার।

ফিরিয়ে দিলে মহাপ্রভু
প্রাচ্য দেশের শিক্ষা,
স্বর্গে যাবার পথের মোড়ে
শ্রেষ্ঠ সহায় ভিক্ষা।
ছাড়তে তবু মিথ্যে মায়া
মিথ্যে পাপীর কান্না,
সভ্যতা কয়, পাওয়ার আগেই
চাই চ্যাঁচানো ‘আর না’।

সেলাম করি সরকার!
চোখের আব্রু ঘুচ্‌লো, এবার
মনের আব্রু দরকার।

ছোট্ট চোখে অমূল্য এই
একটুখানি দৃষ্টি,
এই দু'চোখে আর ধরে না
তোমার মহাসৃষ্টি!
সভ্যতার এ কীর্তি তুলুক
শূন্যে জয়ধ্বজা,
আমার দেখা ফুরোক, এবার
তোমরা দেখো মজা।

সেলাম করি সরকার!
দেহের আব্রু ঘোচালে, আজ
চোখের আব্রু দরকার॥

১৯৪৩

শাস্তি

ভুখ-মিছিলে চোখের আলোর কোনোই মূল্য নাস্তি–
এই কথাটাই সবার বড়ো শাস্তি।

কোন্ প্রভাতের পাখির গানে কবে,
হারিয়ে যাবে আজকে দিনের আর্ত হাহাকার–
শরৎ আবার মেলবে ডানা ফুল-মেঘে ধব্‌ধবে,
আমার হৃদয় ফিরবে না তো আর!

আকাশ-ছেঁড়া সোনার তারার অক্ষয় বৈভবে
মনের আসন সাজিয়েছিলাম কবে।
তোমার ক্ষণিক-আবির্ভাবে ধন্য সে বেদীতে
রক্ত-লোলুপ যুগের দেবী এলেন প্রাপ্য নিতে।
তোমার পায়ে দেবার মতো যৎসামান্য পুঁজি
সকল তাকেই খাজনা দিয়ে নতুন ভিটে খুঁজি।

শস্ত্রপাণির বজ্রঘোষে স্বপ্ন নাহি বাঁচে,
নগদ লাভের হট্টরোলে স্মৃতির কী দাম আছে?
তোমায় যদি বসাই এনে মনের সিংহাসনে
সর্বজনের মুক্তি হবে হয় না তা তো মনে;
কালের যন্ত্র তাই বা কোথায় হলাম সত্যিকার?
চিন্তা-মুরুব্বিরা করেন যথার্থ ধিক্কার।
তবুও যে মনের পর্দা হঠাৎ ছিঁড়ে যায়,
চূর্ণ কেশের স্পর্শ আসে দক্ষিণা হাওয়ায়–
যুগান্তরের সন্ধিতে তার কোনোই মূল্য নাস্তি,
অবুঝ মনে এই কথাটাই সবার বড়ো শাস্তি॥

২৭ মার্চ ১৯৪৪

জয়ের আগে

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পায়ের নিচে
কত অরণ্য-গিরি-জনপদ গুঁড়ায়ে গেছে,
নিঃসাড় এই প্রেত-পল্লীরও দগ্ধ মাঠে
ফেলিল চরণ! মহাশ্চর্য কী আর আছে!
প্রণমি তোমারে, দিগ্বিজয়ের রাজ্যভাগ
তোমারি থাকুক, আমরা কেবল ভিক্ষা চাই–
যুদ্ধের পথ এঁকেছ যেখানে অশ্বখুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই।

সাত সমুদ্র তেরো নদী নখ-মুকুরে বটে,
কূপের বার্তা তত জানাশোনা হয়তো নেই,
পক্ষীরাজের চর্যা যাহার আশৈশব
ভেক-পরিচয় নহেক তাহার আয়ত্তেই।
কাহিনী তোমার ইতিবৃত্তে রক্ষণীয়,
মিনতি মোদের, ভট্টজনেরে ভিক্ষা দিয়ো;
আমাদের শুধু দিয়ো কিঞ্চিৎ চরণ-ছায়া
এবং তোমার দর্শন অতি দর্শনীয়।

রাজার কাহিনী বহু-বিশ্রুত, প্রজার কথা
রাজভট্টের মহাকাব্যেতে ক্বচিৎ-ই মেলে,
রাজ্যশাসনও শুনি লোকমুখে দুরূহ নয়
রাজপুরুষেরা রাজস্বর্ণের অংশ পেলে।
তাই অনুরোধ, রাজকন্যার সোহাগ ফাঁকে
অতি অভাজন প্রজাগণ প্রতি করুণা করি’
দিয়ো একবার দর্শন–বহু বিজ্ঞাপিত,
ক্রূর বুভুক্ষা ভুলি যাতে সেই গর্ব স্মরি’।

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পুচ্ছ ঘেরা
মরকত আর বৈদুর্যের মালার প্রতি
করিব না লোভ, শপথ তোমার, ঈর্ষাবশে

ভাগ্যে তোমার করিব না রোষ, দণ্ডপতি!
বহুপ্রতীক্ষমানা-বাঞ্ছিত হে বীরবর,
অতি দরিদ্র অভাজন মোরা ভিক্ষা চাই,
যুদ্ধের পথ এঁকেছ যেখানে অশ্বখুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই॥

১৯৪৪

নষ্টচাঁদ

এ-আষাঢ়ে শেষ হোক কান্নার বন্যা
ও-আষাঢ়ে লেখা যাবে মেঘদূত,
ক’বছর মন দিয়ে করো ঘরকন্না
বুড়োকালে প্রেম হবে অদ্ভুত।
মুখোমুখি বসে শুধু সকালে ও সন্ধ্যায়
দম্পতি-সুখ বলো হয় কার?
সংসার-ধর্মেতে যে মেয়েরা মন দ্যায়
পৃথিবীতে তাদেরি তো জয়কার।

মেয়ে মানুষের বেশি মন থাকা উচিত না,
আমাদের মন তাই পারিনেকো সাম্‌লে।
রুদ্র-গ্রীষ্মে আকাশে থাকেই তো তৃষ্ণা
সব মিটে যাবে চোখের বর্ষা নাম্‌লে।
দুটো পয়সার সাশ্রয় কিসে হবে
সেদিকে বরং পারো যদি চোখ রাখ্‌তে,
বুড়ো হয়ে যদি বেঁচে ও বর্তে রবে
পাকা-বাড়ি করে’ সেখানে পারবে থাকতে।
শখ্‌-টখ্‌ যত সবই জেনো ছেলেমান্‌ষি
কুড়ির পরে কি ও-সব রাখ্‌তে আছে?
জীবন তো নয় সুখের জোয়ারে পান্‌সি,
আসল প্রশ্ন প্রাণটা কী ভাবে বাঁচে।

হঠাৎ সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি
আগ্নেয়গিরি মেঘের চূড়ায় গলিত চাঁদের ধারা।
পাশ ফিরে শুই; চাঁদের ভেল্কি সবই জানা গেছে মেকি,
মিথ্যে শরৎ, নেহাৎই মিথ্যে আকাশ-ছড়ানো তারা।
তুমি পাশে থাকো রূপোর কাঠিতে মূর্ছিতা চিরদিন–
গৃহিণী-সচিব-শিষ্যা এবং–এবং কি জানি কী যে,
জানি না, জান্‌তে চাইনে, জান্‌লে রোজগার হবে ক্ষীণ,
চাঁদ তো উপোসে মরে না, কিন্তু বেঁচে থাকা চাই নিজে॥

১৯৩৮

প্রথম গ্রীষ্ম

গ্রীষ্মের উত্তাপ আসে শীতের আবদ্ধ দরোজায়;
মৃদু তার করাঘাত, যেন রজনীর শেষ ক্ষণে
কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ লঘু ক্ষীণ ভীত আবাহনে
ডেকে যায়, ডেকে যায়, তারপর হঠাৎ হারায়!
এইতো জাগার ক্ষণ, এরপর তপ্ত আলিসায়
কাকের কর্কশ-কণ্ঠ, এরপর অবসন্ন মনে
অগ্নির অঙ্গুলি স্পর্শ, মধ্যাহ্নের কঠোর শাসনে
সহস্রের সমুদ্রের মাঝে যাবে হৃদয় হারায়ে।

যৌবনের ভালোবাসা কতোদিন মৃত্যুহিম যেন–
অবসন্ন, এলায়িত, খেলাক্লান্ত শিশুর মতন।
গ্রীষ্মের প্রথম তাপ! এনেছ কি উদ্বেল সফেন
বিশল্যকরণী সুবা, স্বাদে যার জাগে অচেতন?
পার্বতীর তপোতাপে গলেনি কি মহেশের ধ্যানও?
হৃদয়! ঘুমন্ত আর কতদিন? আর কতক্ষণ?

৭ অক্টোবর ১৯৩৮

পলাতক

চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ্ জ্বালিয়ে–
গেল পালিয়ে।

গেল চাঁদ, গেল কোথা, কদ্দুর?
পেরিয়ে সমুদ্দুর,
পেরিয়ে আকাশ ভরা তারা–
পার হয়ে গেল চাঁদ চোখের পাহারা।
মনের খুকুকে চুপে ঘুম পাড়িয়ে
গেল চাঁদ দেশ ছাড়িয়ে।

কপালে চুমোর টিপে লিখন এঁকে
গেল চাঁদ কোথা জানে কে?
গেল কি সে পশ্চিমে তুষার দেশে?
গেল সে ভেসে?
সেই শাদা দেশে বুঝি শাদা কপালে–
চাঁদা মামা টিপ্ লাগালে?
গেল চাঁদ, গেল পালিয়ে
আঁধার-কপালে টিপ্ দীপ জ্বালিয়ে।
গেল কি সে আমাদের আকাশ হ'তে
কালো এক ঝড়ের স্রোতে?
রাত আরো কতই বাকি?
মনের খুকুর ঘুম ভাঙবে না কি?
কালো রাত কাট্‌বে না কি?

চাঁদের কপালে কেন টিপ্ জ্বালিয়ে,
চাঁদ চুপে গেল পালিয়ে?
ক্লান্ত অবশ চোখ জাগে পাহারা
তন্দ্রাহারা,
ছন্দহারা
চোখের তারা।

আঁধার কপালে কেন টিপ্ জ্বালিয়ে
দুষ্টু চতুর চাঁদ গেল পালিয়ে?

৩০ এপ্রিল ১৯৪৪

কোন্ পথে

শালের বনের ফাঁকে শাদা সরু পথ কোথা গেছে?
কোন্ পথে উড়ে’ চলে বুনো হাঁস?—সকল পথের
হয়েছে কিনারা, একদিন অরণ্যের নিচে নিচে
আমিও এসেছি দেখে চক্রবালে অবসান এর।

ও-পথে ওদের পিছে হৃদয়েরে দেখেছি পাঠায়ে
পৃথিবীর দশ দিকে—ক্ষেতে, মাঠে সমুদ্রে, পাহাড়ে,
সব পথ, ধাঁধা যেন, ঘুরে ফিরে যায় শেষ হয়ে
চেনা এক গম্বুজের পাশে, চেনা সড়কের ধারে।

বুনো হাঁস সেই পথে উড়ে’ যায় ধোঁয়ার নেশায়
রোস্‌ট্ কি কাবাব হয়ে বিহঙ্গ জন্মেরে ধন্য করে;
সেই পথে দেহাতের মেয়েদল চলে কারখানায়
পায়েচলা পথ ছেড়ে লোহা বাঁধা সম্ভ্রান্ত শহরে।
বনের আলের পথে, চাষার মেয়ের পিছে পিছে
আমার হৃদয় গিয়ে থামে শেষে চৌরঙ্গির পিচে॥

১৯৪৫

সৈনিক, মৈনাক হও

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে

সৈনিক, টিউনিক কোথা? যুদ্ধোদ্যত কোথা বেয়োনেট্?
অধুনা শরণাপন্ন অন্তঃপুরে অঞ্চলের নিচে?
রাইফেল কি ফেল বন্ধু? কোথা ধার উগ্র সে কিরিচে?
বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ? আমাদেরো মাথা হেঁট।

মৈনাক যে ছিলো স্তব্ধ, জরদ্গার, পাথরে নিরেট,
তারে যে হেনেছ কথা তীক্ষ্ণবাক্যে, সে কি সব মিছে?
স্পষ্ট সত্য বলি শোনো, শৃঙ্খলার গুরুতর ব্রিচ্-এ
অকস্মাৎ রণে ভঙ্গ সংগ্রামের নহে এটিকেট্!

যখন আছিল শুধু দীর্ঘদিন, নিস্পন্দ প্রহর,
অরণ্য যখন ছিল স্বপ্নে মগ্ন, অন্ধ অচেতন–
মৈনাকেরে সেইদিন চেয়েছিলে বানাতে সৈনিক।
আজ পরিহাসলোভী পঞ্চশর প্রতিশোধ নিক্;
অরণ্য জাগ্রত আজ, শোনো তার মদির গুঞ্জন,
সৈনিক, মৈনাকবৎ এইবার বন্ধ করো ঘর।

১৯৪০

নইলে

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে,
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

প্র্যাকটিস্ করেছ কি দৌড়ে?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, আর ভোঁ-উড়ে?
নইলে
রইলে
লরিতে চাপা,
তাড়া ক’রে বাড়ি থেকে বাড়িয়োনা পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা?
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি
যতই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

১৯৪৩

॥সমাপ্ত॥